তাদের কাছে পৌঁছবে! নাকি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় এ বিষয় সম্পর্কিত একটি আয়াত এরূপ ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ۔

অর্থাৎ তারা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় তাদের কাছে এসে যাবেন, ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে এবং মানুষের জন্য জান্নাত ও দোযখের যা ফয়সালা হবার, তা হয়ে যাবে?

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কোরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণত এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন্ দিকে অবস্থান করবেন---এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا۔

এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, এখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে এখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোট কথা, কাফির স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহ্র শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে ওঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বর্ণিত আছে যে, দোযখীরা দোযখে পৌঁছে ফরিয়াদ করবে এবং মুখভরে ওয়াদা করবে যে, আমাদেরকে পুনর্বার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হলে আমরা ঈমান আনব এবং সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই করব না। কিন্তু সবার উত্তরে এ কথাই বলা হবে যে, ঈমান ও সৎকর্মের সময় ফুরিয়ে গেছে ঃ এখন যা বলছ, অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বলছ! কাজেই তা ধর্তব্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। ---(বগভী)

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফির কিংবা ফাসিকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোন্‌টি কোরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

বুখারীতে হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

"পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এ নিদর্শন দেখার পর জগতের সব মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ সময় সম্পর্কেই কোরআন পাকে বলা হয়েছে তখনকার বিশ্বাস স্থাপন কারও জন্য ফলপ্রসূ হবে না।"

সহীহ্ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কিরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এক. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দুই. বিশেষ এক প্রকার ধোঁয়া, তিন. দাব্বাতুল-আরদ, চার. ইয়াজুয-মাজুযের আবির্ভাব, পাঁচ. ঈসা (আ)-র অবতরণ, ছয়. দাজ্জালের অভ্যুদয়, সাত. আট. নয়. প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ---এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং দশ. আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মসনদ-আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-আরদের আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী (র) তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার (র) বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এ ঘটনার অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ' বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে।---(রূহুল মা'আনী)

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, ঈসা (আ)-র অবতরণের পর সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি?

তফসীর রূহুল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি ঈসা (আ)-র অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; ঈসা (আ)-র অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

আল্লামা বিলকিনী প্রমুখ বলেন ঃ এটাও অসম্ভব নয় যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় না হওয়ার এ নির্দেশটি শেষ যমানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে না, বরং কিছুদিন পর এ নির্দেশ বদলে যাবে এবং ঈমান ও তওবা আবার কবুল হতে থাকবে।---(রূহুল মা'আনী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতে যদিও নিদর্শন ব্যক্ত করা হয়নি, যা প্রকাশিত হওয়ার পর তওবা কবুল হবে না, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনা দ্বারা ফুটে উঠেছে যে, এ নিদর্শন হচ্ছে সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয়।

কোরআন স্বয়ং একথা ব্যক্ত করল না কেন, এ সম্পর্কে তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে কোরআনের অস্পষ্টতাই গাফেল মানুষকে হুঁশিয়ার করার ব্যাপারে অধিক সহায়ক। ফলে তারা যে কোন নতুন ঘটনা দেখেই হুঁশিয়ার হবে এবং দ্রুত তওবা করবে।

এছাড়া এ অস্পষ্টতার আরও একটি উপকারিতা এই যে, মানুষ আরও একটি ব্যাপারে সাবধান হতে পারবে। তা এই যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ফলে যেমন সমগ্র বিশ্বের জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তেমনি এর একটি নমুনা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগতভাবে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা তার মৃত্যুর সময় ঘটে।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়তে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ -

অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল হয় না, যারা গোনাহ্ করতে থাকে, এমন কি যখন তাদের কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন বলে ঃ আমি এখন তওবা করছি। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ان توبة العبد يقبل ما لم يغرغر অর্থাৎ বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয়, যতক্ষণ না তার আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঊর্ধ্বশ্বাস সৃষ্টি করে।

এতে বোঝা গেল যে, অন্তিম নিশ্বাসের সময় যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে যায়,

তখন তওবা কবুল হয় না। এ পরিস্থিতিও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তাই আলোচ্য আয়াতে بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ বাক্যে মৃত্যুর সময়কেও বোঝানো হয়েছে। তফসীর বাহরে-মুহীতে কোন কোন আলেমের এ উক্তি বর্ণিতও হয়েছে যে, من مات فقد قامت قيامته—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার কিয়ামত তখনই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।. কেননা, কর্মজগৎ সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মের প্রতিদানের কিছু নমুনা কবর থেকেই শুরু হয়! কবি ছায়েব এক কবিতায় এ বিষয়টিই ব্যক্ত করেছেন ঃ

توبه ها را نفس باز پسیں دست روست
بے خبر دیر رسیدی در محمل بستند

এখানে আরবী ভাষার দিক দিয়ে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে ঃ اَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ এরপর এ বাক্যটিরই পুনরুক্তি করে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ يَأْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا এখানে সর্বনাম ব্যবহার করে বাক্য সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। এতে বোঝা গেল যে, প্রথম বাক্যের কোন কোন নিদর্শন ভিন্ন এবং দ্বিতীয় বাক্যের কোন কোন নিদর্শন ভিন্ন। এ দ্বারা পূর্ববর্ণিত হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত বিবরণের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কিয়ামতের প্রধান নিদর্শন দশটি। তন্মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় সর্বশেষ নিদর্শন, যা তওবার দরজা বন্ধ হওয়ার লক্ষণ।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ قُلِ انْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্‌র প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যদি তোমরা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকতে চাও তবে থাক; আমরাও এজন্য অপেক্ষা করব যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ط
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ مَن جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ج وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا

مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

(১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (১৬০) যে একটি সৎকর্ম করবে সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা স্বীয় (অনিষ্ট) ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে (অর্থাৎ সত্য ধর্মকে পুরো-পুরি গ্রহণ করেনি---সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিক ত্যাগ করেছে এবং শিরক, কুফর ও বিদ-'আতের পথ অবলম্বন করেছে) এবং (বিভিন্ন) দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। (অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপারে মুক্ত। আপনার বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগ নেই। ব্যাস তারা স্বয়ং তাদের ভালমন্দের জন্য দায়ী এবং) তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত। (তিনি দেখছেন) অতঃপর (কিয়ামতে) তাদের কৃতকর্ম বলে দেবেন (এবং প্রমাণ উপস্থাপিত করে শাস্তির যোগ্যতা প্রকাশ করে দেবেন)। যে সৎকর্ম করবে, সে (কমপক্ষে) তার দশগুণ পাবে (অর্থাৎ মনে করা হবে যে, সে যেন সৎ কর্মটি দশবার করেছে এবং এক সৎকর্মের জন্য যে পরিমাণ সওয়াব পেত এখন সে সওয়াবের দশগুণ পাবে)। এবং যে মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে (বেশী পাবে না)। তা ছাড়া তাদের প্রতি (বাহ্যতঃও) জুলুম করা হবে না (যে, তাদের কোন সৎকর্ম লিখিত হবে না কিংবা কোন অসৎ কর্ম বেশী লিখা হবে এমনিটিও হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা-আন'আমের অধিকাংশই মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ্ তা'আলার সোজা-পথ একমাত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভর-শীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা-সরল পথ ছেড়ে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদের আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ঈহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাদের আল্লাহ্র সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের পথিক-দের সাথে আপনার কোনরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল

পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে ; যেমন, মুশরিক, আহলে কিতাবদের অনুসৃত পথ আর কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদ'আতের পথ। এগুলো মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়।

বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

অর্থাৎ যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র রসূল তাদের থেকে মুক্ত। তাঁর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর তাদেরকে এই কঠোর শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে যে, তাদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সমর্পিত রয়েছে। তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন।

আয়াতে উল্লিখিত 'ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার' অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেওয়া।

ধর্মে বিদ'আত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী ঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে—কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বিদ'আতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন ঃ বনী-ইসরাইলরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী-ইসরাইলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোযখে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি ? উত্তর হল ঃ যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে।—(তিরমিযী, আবূ দাউদ)

তিবরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারূকে আযম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন ঃ এ আয়াতে বিদ'আতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত রয়েছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহ্‌মদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা আমার ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেও। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলো। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে অর্ধহাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধনকে দূরে নিক্ষেপ করে। —(আবূ দাউদ, আহমদ)

তফসীর মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, উপরোক্ত হাদীসে দলের অর্থ সাহাবায়ে কিরামের দল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করে কোরআন দান করেছেন এবং অন্যান্য ওহীও দান করেছেন, যেগুলোকে হাদীস বা সুন্নত বলা হয়। কোরআনে অনেক আয়াত দুরূহ অথবা সংক্ষিপ্ত অথবা অস্পষ্ট রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলের মাধ্যমে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার ওয়াদা করেছেন। ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ আয়াতের অর্থ তাই।

রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআনের দুরূহ ও অস্পষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর ও স্বীয় সুন্নতের বিশদ বিবরণ তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ, তথা সাহাবায়ে কিরামকে ব্যাখ্যা ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের কর্ম গোটা শরীয়তেরই বর্ণনা ও তফসীর।

অতএব প্রত্যেক কাজে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করার মধ্যেই মুসলমানদের সৌভাগ্য নিহিত। যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থে সন্দেহ ও দ্ব্যর্থবোধকতা দেখা দেয়, তাতে সাহাবায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করা শ্রেয়।

এ পবিত্র মূলনীতি উপেক্ষা করার দরুনই ইসলামে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে। সাহাবীদের কর্ম ও তফসীরকে উপেক্ষা করে নিজের পক্ষ থেকে যা মন চায়, কোরআন ও সুন্নতের অর্থ তাই স্থির করা হয়। কোরআন এ ভ্রান্তপথ অনুসরণ করতে বার বার নিষেধ করেছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও তা বর্জনের জন্য আজীবন কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তিনি তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। এক. যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থে কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন

কোন অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কিরামের তফসীরের বিপরীত)। দুই. যে ব্যক্তি তকদীরকে অস্বীকার করে। তিন. যে ব্যক্তি জবরদস্তিমূলকভাবে মুসলমানদের নেতা হয়ে যায়---যাতে ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ্ লাঞ্ছিত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন। চার. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম-কৃত বস্তুকে হালাল মনে করে ; অর্থাৎ মক্কার হেরেমে খুন-খারাবী করে কিংবা শিকার করে। পাঁচ. যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সন্তান-সন্ততির সম্মান হানি করে। ছয়. যে ব্যক্তি আমার সুন্নত ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ -

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলাই কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন।

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহৃদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করবে তাকে দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করবে, তাকে শুধু এক গোনাহ্র সমান বদলা দেওয়া হবে।

বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের শুধু ইচ্ছা করে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়---ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়, অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ্ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেওয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহ্র দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প। ---(ইবনে কাসীর)

হাদীসে কুদসীতে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে---যে ব্যক্তি একটি সৎ কাজ করে, সে দশটি সৎ কাজের সওয়াব পায় ; বরং আরও বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ্ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহ্র সম-পরিমাণ পায়, কিংবা তাও আমি মাফ করে দেব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ্ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা (অর্থাৎ দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সৎ কাজের প্রতিদান দশগুণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় আরও বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সত্তর গুণ বা সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে।

এ আয়াতের শব্দ বিন্যাসে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে جَاءَ بِالْحَسَنَةِ বলা হয়েছে, عَمِلَ بِالْحَسَنَةِ বলা হয়নি। তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শুধু সৎ কাজ অথবা অসৎ কাজ করলেই এ প্রতিদান ও শাস্তি হবে না, বরং প্রতিদান ও শাস্তির জন্য মৃত্যু পর্যন্ত এ সৎ অথবা অসৎ কাজে কায়েম থাকা শর্ত। ফলে যদি কোন লোক কোন সৎ কাজ করে; কিন্তু অতঃপর তার কোন গোনাহ্র কারণে তা বরবাদ হয়ে যায়, তবে এ কর্মের প্রতিদান পাওয়ার যোগ্যতা তার থাকবে না, যেমন কুফর ও শিরক (নাউযুবিল্লাহ্) যাবতীয় সৎ কর্মই বরবাদ করে দেয়। এছাড়া আরও কতিপয় গোনাহ্ এমন রয়েছে যেগুলো কোন কোন সৎ কর্মকে বাতিল ও অকেজো করে দেয়। উদাহরণত কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ অর্থাৎ তোমরা স্বীয় দান-খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট প্রদান করে বরবাদ করো না।

এতে বোঝা যায় যে, অনুগ্রহ প্রকাশ করলে কিংবা কষ্ট দিলে দান-খয়রাতরূপী সৎকর্ম বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মসজিদে বসে সাংসারিক কথাবার্তা বলা সৎ কর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। এতে বোঝা যায় যে, মসজিদে যেসব সৎকর্ম নফল নামায, তসবীহ ইত্যাদি করা হয় সাংসারিক কথা-বার্তার কারণে তা পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়।

এমনিভাবে অসৎ কাজ থেকে তওবা করলে আমলনামা থেকে তার গোনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হয়---মৃত্যু পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে না। তাই আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, যে লোক সৎ অথবা অসৎ কোন কাজ করে, তাকেই প্রতিদান অথবা শাস্তি দেওয়া হবে; বরং বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আমার কাছে সৎকর্ম নিয়ে আসবে তাকেই দশগুণ সওয়াব দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তি আমার কাছে অসৎ কাজ নিয়ে আসবে সে একটি অসৎ কাজেরই শাস্তি পাবে। আল্লাহ্র কাছে নিয়ে আসা তখনই হবে, যখন একাজ জীবনের শেষ পর্যন্ত কায়েম ও অব্যাহত থাকে, সৎ কাজকে বিনষ্টকারী কোন কিছু না ঘটে এবং অসৎ কাজ থেকে তওবা ও ইস্তেগফার করতে থাকে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ---অর্থাৎ এ সর্বোচ্চ আদালতে কারও প্রতি জুলুম হওয়ার আশংকা নেই। কারও সৎ কাজের প্রতিদান হ্রাস করারও আশংকা নেই এবং কারও অসৎ কাজের শাস্তি বেশী হওয়াও সম্ভব নয়।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَٰلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ
كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ
وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

(১৬১) আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন—একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৬২) আপনি বলুন ঃ আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌রই জন্য। (১৬৩) তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন ঃ আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন পালনকর্তা খুঁজব, অথচ তিনি-ই সবকিছুর পালনকর্তা? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং এককে অন্যের উপর মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার পালনকর্তা দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে (ওহীর মাধ্যমে) একটি সরল পথ প্রদর্শন করেছেন, (প্রমাণাদির দ্বারা সপ্রমাণ হওয়ার কারণে) সুদৃঢ় একটি ধর্ম, যা ইবরাহীম

(আ)-এর তরীকা, যাতে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই। এবং সে (ইবরাহীম) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (এবং) আপনি (এ ধর্মের ব্যাখ্যার জন্য) বলে দিন ঃ (এ ধর্মের সার-কথা এই যে,) নিশ্চয় আমার নামায, আমার সমগ্র আরাধনা, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য। (আরাধ্য হওয়ার যোগ্যতায় অথবা পালনকর্তার ক্ষমতায়) তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি (এ দ্বারাই অর্থাৎ এ ধর্মে থাকতেই) আদিষ্ট হয়েছি এবং (আদেশ অনুযায়ী) আমি (এ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে) আনুগত্যকারীদের প্রথম আনুগত্যকারী। আপনি (মিথ্যার প্রতি আহবানকারীদেরকে) বলে দিন ঃ (তওহীদ ও ইসলামের স্বরূপ ফুটে উঠার পর তোমাদের কথা অনুযায়ী) আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে পালনকর্তা বানাবার জন্য খোঁজ করব ? (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ্ আমি কি শিরক করব) ? অথচ তিনি সবকিছুর মালিক। (সব বস্তু) তাঁর মালিকানাধীন। (বস্তুত মালিকানাধীন কোন বস্তু মালিকের অংশীদার হতে পারে না)। আর (তোমরা যে বল, তোমাদের গোনাহ্ আমাদের উপর বর্তাবে, এটা নিরর্থক বৈ নয় যে, গোনাহ্‌গার পবিত্র থাকবে এবং কেবল অন্য ব্যক্তি গোনাহ্‌গার হবে। বরং সত্য কথা এই যে,) যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, তা তার দায়িত্বে থাকে এবং একে অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। (বরং সবাই নিজ নিজ বোঝাই বহন করবে।) অতঃপর (সবার কাজ করার পর) সবাইকে পালন-কর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যে, যে বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে (কেউ এক ধর্মকে সত্য বলত এবং কেউ অন্য ধর্মকে। সেখানে কার্যত ঘোষণার মাধ্যমে ফয়সালা হয়ে যাবে। ফলে সত্যপন্থীরা মুক্তি এবং মিথ্যাপন্থীরা শাস্তি পাবে।) এবং তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেছেন (এ নিয়ামতে একে অন্যের সমতুল্য) এবং (বিভিন্ন বিষয়ে) এককে অন্যের উপর মর্যাদায় সমুন্নত করে-ছেন---(এ নিয়ামতে একজন অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠ)। যাতে (এসব নিয়ামত দ্বারা) তোমাদেরকে (বাহ্যত) পরীক্ষা করেন সে বিষয়ে (যা উল্লিখিত নিয়ামতের মূল্য দিয়ে নিয়ামত দাতার আনুগত্য করে---এবং কে তাকে তুচ্ছ মনে করে আনুগত্য করে না। অতএব কিছুলোক আনুগত্য ও কিছু লোক অবাধ্য হয়েছে। উভয়ের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করা হবে। কেননা) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী (-ও) বটে। আর নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় (-ও)। (অতএব অবাধ্যদের জন্য শাস্তি রয়েছে এবং অনুগতদের জন্য করুণা রয়েছে। অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে আগমনকারীদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। সুতরাং মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য ধর্ম অনুযায়ী আনুগত্য অবলম্বন করা এবং মিথ্যা অবলম্বন এবং সত্যের বিরোধিতা থেকে বিরত হওয়া)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আন'আমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কমবেশী করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্য ধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম

দু'আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মত নিজ ধ্যান-ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এপথ বাতলে দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবী। তোমরাও ইচ্ছা করলে হিদায়তের আয়োজন তোমাদের জন্যও বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ — এখানে قيام শব্দটি قيم ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ়। অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় ---যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ; কারও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে---এমন কোন নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, ইবরাহীম (আ)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্ব সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে ঃ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (আমি তোমাকে মানবজাতির নেতারূপে বরণ করব।)

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্বৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদীরা ওযায়ের (আ)-কে, খৃস্টানরা ঈসা (আ)-কে এবং আরবের মুশরিকরা হাজারো ধরনের পাথরকে আল্লাহ্র অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ, তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের পংকলিতা থেকে মুক্ত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ

وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এখানে نسك শব্দের অর্থ কোরবানী। হজ্বের ক্রিয়া-কর্মকেও نسك বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই ناسك শব্দটি عابد (ইবাদতকারী) অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এ সবকটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকেও এসব তফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সব ধরনের ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই, আমার নামায, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত।

এখানে দীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এটি যাবতীয় সৎ কর্মের প্রাণ ও দীনের স্তম্ভ। এরপর অন্য সব কাজ ও ইবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত যাঁর কোন শরীক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পূতঃ-পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে।

তফসীরে দুররে-মনসূরে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, প্রত্যেক মুসলমান এ আয়াতটি বার বার পাঠ করুক এবং একে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুক।

এ আয়াতে বর্ণিত "নামায এবং সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত" কথাটির অর্থ এই যে, এগুলোতে শিরক, রিয়া অথবা কোন পার্থিব স্বার্থের প্রভাব না থাকা চাই। জীবন ও মরণ আল্লাহ্‌র জন্য হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আমার জীবন ও মরণ তাঁরই করায়ত্ত। কাজেই জীবনের কাজকর্ম ও ইবাদত তাঁরই জন্য হওয়া অপরিহার্য। এ অর্থও হতে পারে যে, যেসব কাজকর্ম জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যেমন নামায, রোযা, অপরের সাথে লেনদেনের অধিকার ইত্যাদি এবং যেসব কাজকর্ম মৃত্যুর সাথে জড়িত অর্থাৎ ওসীয়ত ও মৃত্যু-পরবর্তী ব্যবস্থা, তা সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই বিধি-বিধানের অনুগামী।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ—অর্থাৎ

আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গম্বরই হন যাঁর প্রতি ওহী অবতারণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اول ما خلق الله نوری আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। ---(রূহুল মা'আনী)

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না ঃ চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরিক ওলীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত ঃ তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে ঃ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ—অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মত আমিও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা। আমার কাছ থেকে এরূপ পথভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى —অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইন-কানুন দুনিয়ার মত নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে; যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহ্র আদালতে এর কোন অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্য জনকে কিছুতেই দায়ী বা ধৃত করা হবে না। এ আয়াত দৃষ্টেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার উপর পিতা-মাতার

অপরাধের কোন দায়দায়িত্ব পতিত হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) এক মৃত ব্যক্তির জানাযায় একজনকে কাঁদতে দেখে বললেন ঃ জীবিতদের কাঁদার কারণে মৃতরা শাস্তি ভোগ করে। ইবনে-আবী মুলায়কা (রা) বলেন ঃ আমি এ উক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি এমন ব্যক্তির এ উক্তি বর্ণনা করছ, যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না এবং তাঁর নির্ভরযোগ্যতায়ও কোনরূপ সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে শুনতেও ভুল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কোরআন পাকের সুস্পষ্ট ফয়সালাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাহল, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ——অর্থাৎ একের পাপ অপরের ঘাড়ে চাপতে পারে না। অতএব জীবিত ব্যক্তির কাঁদার কারণে নিরপরাধ মৃত ব্যক্তি কেমন করে আযাবে থাকতে পারে ?---(দুররে-মনসূর)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ অবশেষে তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে তোমাদের সব মতবিরোধেরই ফয়সালা শোনানো হবে। উদ্দেশ্য এই যে, বাকপটুতা ও জটিল আলোচনা পরিহার করা এবং পরিণাম চিন্তা করা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিয়ে সূরা আন'আম সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অতীত ইতিহাস ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিবৃত্তান্ত উপস্থিত করে ভবিষ্যতের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ —— خلائف শব্দটি خليفة-এর বহুবচন। এর অর্থ কারও স্থলাভিষিক্ত ও গদীনশীন। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থলে অভিষিক্ত করেছেন। তোমরা আজ যে গৃহ ও সম্পত্তিকে নিজ মালিকানাধীন বল ও মনে কর, এরূপ নয় যে, কাল তাই তোমাদের মত অন্য মানুষের মালিকানাধীন ছিল না! আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সরিয়ে তোমাদেরকে তাদের স্থলে বসিয়েছেন। এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, তোমাদের মধ্যেও সবাই সমান নয়---কেউ নিঃস্ব, কেউ সম্পদশীল, কেউ লাঞ্ছিত এবং কেউ সম্মানিত। এটাও জানা কথা যে, ধনাঢ্যতা ও মান-সম্মান মানুষের ক্ষমতাধীন ব্যাপার হলে কেউ নিঃস্ব ও লাঞ্ছিত হতে সম্মত হতো না। পদমর্যাদার এ পার্থক্যও তোমাদেরকে এ কথাই অবহিত করছে যে, ক্ষমতা অন্য কোন সত্তার হাতে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব করেন, যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لِيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ ——অর্থাৎ তোমাদেরকে

অন্যের স্থলে অভিষিক্ত করা তাদের ধন-সম্পত্তির মালিক করা এবং সম্মান ও লাঞ্ছনার বিভিন্ন স্তরে রাখার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের চক্ষু খুলুক এবং এ বিষয়ের পরীক্ষা হোক যে, অন্যদেরকে হটিয়ে যেসব নিয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তোমরা সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ ও অনুগত হও, না অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হও।

ষষ্ঠ আয়াতে উভয় অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ —অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অবাধ্যকে দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং অনুগতদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সূরা আন'আমের শুরু হামদ দ্বারা হয়েছে এবং সমাপ্তি মাগফিরাতের দ্বারা হলো। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে হামদের তওফীক এবং মাগফিরাতের গৌরবে ভূষিত করুন।

হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সূরা আন'আম সবটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এমন জাঁকজমকের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সাথে তসবীহ পাঠ করতে করতে আগমন করেছেন। এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম (রা) বলেন ঃ সূরা আন'আম কোরআন পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সূরাসমূহের অন্যতম।

কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে রোগীর উপর সূরা আন'আম পাঠ করা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিরাময় করেন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সূরা আ'রাফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓصٓ ① كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ② اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ③ وَكَمْ مِّنْ
قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَاۗءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَاۗىِٕلُوْنَ ④ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ
اِذْ جَاۗءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑤ فَلَنَسْـَٔـلَنَّ الَّذِيْنَ
اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔـلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ⑥ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا
كُنَّا غَاۗىِٕبِيْنَ ⑦

আল্লাহ্‌র নামে শুরু, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) এটি একটি গ্রন্থ যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব, এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটি বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। (৩) তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (৪) আর তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমাদের আযাব রাত্রি বেলায় পৌঁছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। (৫) অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই ছিল যে, তারা বলল ঃ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসূলগণকে। (৭) অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তুত আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না।

সূরার বিষয়-সংক্ষেপ

সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রিসালতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত كِتَابٌ أُنْزِلَ নবুয়তের এবং ষষ্ঠ আয়াতে فَلَنَسْئَلَنَّ পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকূর অর্ধেক থেকে ষষ্ঠ রুকূর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ থেকে ২১তম রুকূ পর্যন্ত আম্বিয়া (আ) ও তাঁদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রিসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব কাহিনীতে রিসালতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে---যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২২তম রুকূর অর্ধেক থেকে ২৩তম রুকূর শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরালোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও ২২তম রুকূর শুরুতে এবং সর্বশেষ ২৪তম রুকূর বেশীর ভাগ অংশে তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। এ সূরার খুব কম অংশই এমন আছে যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে।---(বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

الٓمٓصٓ (-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন এবং এটি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল [সা]-এর মধ্যকার একটি রহস্যপূর্ণ বিষয়। উম্মতকে তা জানানো হয়নি, বরং এ নিয়ে খোঁজা-খুঁজি করতে বারণ করা হয়েছে) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ——এটা (অর্থাৎ কোরআন) এমন একটি গ্রন্থ, যা (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) আপনার কাছে এজন্য প্রেরিত হয়েছে, যাতে আপনি এর মাধ্যমে (মানুষকে অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে) ভীতি-প্রদর্শন করেন। অতএব আপনার অন্তরে (কারও অমান্য করার দরুন) কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। (কেননা কারও অমান্য করার দরুন আপনাকে প্রেরণ করার লক্ষ্য যে সত্য প্রচার তাতে কোন ত্রুটি আসে না। অতএব, আপনি কেন মনকে খাট করবেন!) এবং এটি (কোরআন বিশেষভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ। (অতঃপর সাধারণ উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কথাটি যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন) তোমরা এর (গ্রন্থের) অনুসরণ কর, যা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (গ্রন্থের অনুসরণ এই যে, একে মনেপ্রাণে সত্য বলে বিশ্বাসও কর এবং এর বাস্তবায়নেও তৎপর হও)। আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে (যিনি তোমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য কোরআন নাযিল করেছেন) অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না (যারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে। যেমন, শয়তান, জ্বিন ও মানুষ। কিন্তু দয়ার্দ্র উপদেশ সত্ত্বেও) তোমরা অল্পই উপদেশ মান্য করে থাক। অনেক জনপদ (এমন) রয়েছে যেগুলোকে (অর্থাৎ যেগুলোর অধিবাসীদেরকে, তাদের কুফর ও মিথ্যারোপের কারণে) আমি ধ্বংস করেছি

---তাদের কাছে আমার আযাব (হয়) রাত্রে পৌঁছেছে (যা নিদ্রা ও বিশ্রামের সময়), না হয় এমতাবস্থায় (পৌঁছেছে) যে, তারা দুপুরে বিশ্রামরত ছিল। (অর্থাৎ কারও কাছে এক সময় এবং কারও কাছে অন্য সময় এসেছে)। অনন্তর যখন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হল, তখন তাদের মুখ থেকে এছাড়া (অন্য) কোন কথাই বের হচ্ছিল না যে, 'নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী' (ও দোষী) ছিলাম। (অর্থাৎ স্বীকারোক্তির সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তারা স্বীকারোক্তি করেছিল! এ হচ্ছে পার্থিব সাজা)। অতঃপর (পরকালের শাস্তিরও ব্যবস্থা হবে। কিয়ামতে) আমি তাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করব, যাদের কাছে পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিল (যে, তোমরা পয়গম্বরদের কথা মেনেছিলে কি না)? আর আমি পয়গম্বর-দেরকেও অবশ্যই প্রশ্ন করব (যে তোমাদের উম্মতগণ তোমাদের কথা মেনেছিল কি না? يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ উভয় প্রশ্নেরই উদ্দেশ্য কাফির-দেরকে শাসানো। অতঃপর যেহেতু আমি সবকিছু জ্ঞাত, তাই নিজেই সবার সামনে তাদের কার্যকলাপ) বর্ণনা করব। বস্তুত আমি (কাজ করার সময় ও তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে) অনুপস্থিত ছিলাম না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পূর্ণ সূরার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার বিষয়বস্তুর অধিকাংশই পরকাল ও নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত। শুরু থেকে ষষ্ঠ রুকূ পর্যন্ত বেশীর ভাগেই পরকালের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ থেকে একুশতম রুকূ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর-গণের অবস্থা এবং তাঁদের উম্মতদের ঘটনাবলী, প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ—প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ এ কোরআন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থ হল কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে।---(মাযহারী)

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হিফাযতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারও কারও মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই অন্তরের মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ আপনার কর্তব্য শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না---এ দায়িত্ব আপনার নয়। অতএব আপনি অহেতুক মর্মাহত হবেন কেন?

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে ? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না ?---(মাযহারী)

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে ? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্র পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ اللهم اشهد—অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আপনি সাক্ষী থাকুন।

মসনদ আহমদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব, পৌঁছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়।---(মাযহারী)

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে---যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে যায়।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

(৮) আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। (৯) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। (১০) আমি

তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর সেদিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমল ও বিশ্বাসের) যথার্থই ওজন হবে (যাতে সাধারণভাবে প্রত্যেকের অবস্থার প্রকাশ পায়)। অতঃপর (অর্থাৎ ওজনের পর) যাদের (ঈমানের) পাল্লা ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম হবে (অর্থাৎ মুক্তি পাবে)। এবং যাদের (ঈমানের) পাল্লা হাল্কা হবে (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি জুলুম করত। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাসের ঠাঁই দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য এতে (পৃথিবীতে) জীবিকা সৃষ্টি করেছি। (এর দাবী ছিল এই যে,) তোমরা এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অনুগত হবে, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (এর অর্থ আনুগত্য। অল্প বলার কারণ এই যে, অল্প-বিস্তর সৎকাজ তো প্রায় লোকেই করে, কিন্তু ঈমানের অভাবে তা ধর্তব্য নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ —অর্থাৎ সেদিন যে ভালমন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিক ভাবেই হবে। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভালমন্দ কাজকর্ম কোন জড়বস্তু নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমত পরম প্রভু আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব আমরা যা ওজন করতে পারি না, আল্লাহ্ তা'আলা তাও ওজন করতে পারবেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দাঁড়িপাল্লা স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তুও ওজন করা যায়, যা ইতিপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এতদ্ব্যতীত স্রষ্টার এ শক্তিও রয়েছে যে, তিনি আমাদের কাজকর্মকে জড় আকার-আকৃতি দান করতে পারেন। অনেক হাদীসে এর প্রমাণও রয়েছে যে, বরযখ ও হাশরের ময়দানে মানুষের কাজকর্ম বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করে উত্থিত হবে। কবরে মানুষের সৎকর্মসমূহ সুশ্রী আকারে তাদের সহচর হবে

এবং অসৎ কর্মসমূহ সাপ-বিচ্ছু হয়ে গায়ে জড়িয়ে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের যাকাত দেয়নি, তার ধন-সম্পদ বিষাক্ত সাপের আকারে কবরে পৌঁছবে এবং তাকে দংশন করতে করতে বলবে ঃ আমি তোমার ধনসম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।

এমনিভাবে কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ হাশরের ময়দানে মানুষের সৎ কর্মসমূহ তাদের যানবাহন হবে এবং অসৎ কর্মসমূহ বোঝা হয়ে মাথায় চেপে বসবে। এক সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কোরআন পাকের সূরা বাকারা ও সূরা আলে-এমরান হাশরের ময়দানে দু'টি ঘন মেঘের আকারে এসে সেসব লোককে ছায়া দেবে, যারা এ সূরাগুলো পাঠ করতো।

এমনি ধরনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর আমাদের সব ভালমন্দ কাজকর্ম বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করবে এবং এক একটি পদার্থ-সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে।

কোরআন পাকের অনেক বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا —অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, তাকে সেখানে উপস্থিত পাবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ —অর্থাৎ যে এক কণা পরিমাণও সৎ কাজ করবে, কিয়ামতে তা দেখতে পাবে এবং যে এক কণা পরিমাণও অসৎ কাজ করবে কিয়ামতে তাও দেখতে পাবে। এ সবের বাহ্যিক অর্থ এই যে, মানুষের কাজ-কর্ম পদার্থ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে সামনে আসবে। কাজকর্মের প্রতিদান উপস্থিত পাবে এবং দেখবে---এতে কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন নেই।

এমতাবস্থায় কাজকর্মসমূহকে ওজন করা কোন অসম্ভব অথবা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সব কিছুকে উপস্থিত ও বাহ্যিক অবস্থার কষ্টি পাথরে যাচাই করতে অভ্যস্ত। কোরআন পাক মানুষের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলে ঃ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ অর্থাৎ তারা শুধু পার্থিব জীবনের একটি বাহ্যিক দিক সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে; তাও সম্পূর্ণ নয়। অথচ তারা পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বাহ্যিক ও পার্থিব জীবনে তারা আকাশ-পাতালের খবর রাখে, কিন্তু যেসব বিষয়ের বাস্তব স্বরূপ বিশুদ্ধরূপে উদ্‌ঘাটিত হবে সেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ওজন সংক্রান্ত বিষয়টিকে অস্বীকার

করে না বসে তাই وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ কথাটি একান্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, যাতে বাহ্যদর্শী মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালে আমলের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিয়ামতে আমলের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কোরআনের বহু আয়াতে বিভিন্ন শিরোণামে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিশদ বর্ণনায় হাদীসের সংখ্যাও প্রচুর।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর ঃ আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র ওজন হবে সবচাইতে বেশী। এ কালেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে-হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সব আমলনামাই অসৎ কাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক না আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোন কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে ঃ হায় পরওয়ারদিগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কালেমা 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না-মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে ঃ ইয়া রব, অত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সম্বলিত পাতাটি রাখা হবে। এতে কালেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হাল্কা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না। ---(মাযহারী)

মসনদ, বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নূহ (আ)-র ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ওসীয়ত করছি। কেননা, যদি সাত আসমান ও যমীন এক পাল্লায় এবং কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবূদ্দারদা (রা) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে।---(মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিনের পাল্লা সবসময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপ কর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণত কোরআন পাকের এক আয়াতে আছে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ০

অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। যদি একটি রাঈদানা পরিমাণও ভালমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট। সূরা কারেয়ায় বলা হয়েছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ـ

অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে দোযখে।

এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে মু'মিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় পাপ কর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।---(মাযহারী)

আবূ দাউদে আবূ হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন বান্দাহ্র ফরয কাজসমূহে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন ঃ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

এসব আয়াত ও হাদীসের মর্ম এই যে, মু'মিন মুসলমানের পাল্লাও কোন সময় ভারী এবং কোন সময় হাল্কা হবে। তাই তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন ঃ এতে বোঝা যায় যে, হাশরে দু'বার ওজন হবে। প্রথমে কুফর ও ঈমানের ওজন হবে। এর ফলে মু'মিন ও কাফির পৃথক হয়ে যাবে। এ ওজনে যার আমলনামায় শুধু ঈমানের কালেমাও থাকবে, তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাকে কাফিরদের দল থেকে পৃথক করা হবে। দ্বিতীয় বার

নেকী ও পাপের ওজন হবে। তাতে কোন মুসলমানের নেকী এবং কোন মুসলমানের পাপ ভারী হবে এবং তদনুযায়ী তাকে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে সব আয়াত ও হাদীসের বিষয়বস্তু স্ব স্ব স্থানে যথার্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। ---(বয়ানুল-কোরআন)

আমলের ওজন কিভাবে হবে ঃ আবূ হোরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহ্র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ---অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন স্থির করব না !---(মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তাঁর পা দুটি বাহ্যত যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা)-এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে ঃ দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দু'টি এই ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন ঃ 'সোবহানাল্লাহ্' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায়, আর 'আলহামদু লিল্লাহ্' বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে আবুদ্দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমলের ওজনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না।

হযরত আবূযর গিফারী (রা)-কে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি---এগুলো করা মানুষের জন্য মোটেই কঠিন নয়, কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারী হবে। এক. সচ্চরিত্রতা এবং দুই. অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা।

ইমাম আহ্মদ কিতাবুয-যুহ্দে হযরত হাযেম (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন। তখন একব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ মানুষের সব আমলেরই ওজন হবে, কিন্তু আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল যার কোন

ওজন হবে না। বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দেবে। ---(মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমলনামায় সৎকর্ম কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে ঃ দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাস'আলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছ, তাদের সবার আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে।---(মাযহারী)

তিবরানী ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কীরাত রেখে দেওয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এই কীরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তিবরানী জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের আমলের দাঁড়িপাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সৎকর্ম।

ইমাম যাহাবী (র) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন---যে কালি দ্বারা দীনী ইল্‌ম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলিমদের কালী শহীদদের রক্তের চাইতেও ভারী হবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

এসব হাদীসদৃষ্টে আমলের ওজনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ মনে হয়। কোন কোন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আমলকারী মানুষের ওজন হবে। তারা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী হাল্কা কিংবা ভারী হবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আমলনামারই ওজন করা হবে। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমলসমূহ বস্তুসত্তা বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোর ওজন করা হবে। ইবনে কাসীর এসব হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন ঃ বিভিন্ন রূপে একাধিকবার ওজন হওয়াও বিচিত্র নয়। এসব বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। আমল করার জন্য এ স্বরূপ জানা আদৌ জরুরী নয় ; বরং এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের আমলেরও ওজন হবে। নেক আমলের পাল্লা হালকা হলে আমরা আযাবের যোগ্য হবো। তবে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে স্বীয় কৃপায় কিংবা কোন নবী অথবা ওলীর সুপারিশে ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা।

যেসব হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন কোন ব্যক্তি শুধু কালেমার বদৌলতে মুক্তি পাবে এবং সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে, সেগুলো উপরোক্ত ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা সাধারণ নিয়মের বাইরে বিশেষ কৃপা ও অনুকম্পার কারণে মুক্তি পাবে।

আলোচ্য দু'টি আয়াতে পাপীদেরকে হাশরে লাঞ্ছনা ও আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সত্য গ্রহণ করতে ও তদনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য এবং মালিকসুলভ ক্ষমতা দান করেছি। অতঃপর তোমাদের জন্য ভোগ্য সামগ্রী উপার্জন করার হাজারো পথ খুলে দিয়েছি। রাব্বুল আলামীন যেন পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে চিত্তবিনোদনের আসবাবপত্র পর্যন্ত সব কিছুর একটা বিরাট গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এর ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূপৃষ্ঠে গুদামে সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ পন্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য। যেসব বোকা ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ এ গুদাম থেকে মাল বের করার পদ্ধতি জানে না, কিংবা বের করার পর নিয়ম বুঝে না, তারা এর উপকার থেকে বঞ্চিত থাকে। সমঝদার মানুষ এসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝে এ গুদাম থেকে লাভবান হয়।

মোট কথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফিল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে ঃ قليلا ما تشكرون অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ
فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ⑪ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا
تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ
مِنْ طِيْنٍ ⑫ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا
فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ⑬ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ⑭
قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ⑮ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ⑯ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاۗىِٕلِهِمْ ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ

شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

(১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরী করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি—আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করেছে, কিন্তু ইবলীস; সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১২) আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন ঃ তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল ঃ আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বলল ঃ আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্যই তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ্ বললেন ঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি (করার আয়োজন করতে আরম্ভ) করেছি (অর্থাৎ আদমের মূল পদার্থ তৈরী করেছি। এ মূল পদার্থ থেকেই তোমরা সবাই সৃজিত হয়েছ) অতঃপর (মূল পদার্থ তৈরী করে) আমি তোমাদের আকার-অবয়ব তৈরী করেছি (অর্থাৎ এ মূল পদার্থের দ্বারা আদমের আকৃতি গঠন করেছি। অনন্তর সে আকৃতিই তার সন্তানদের মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এ হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ামত)। অতঃপর (যখন আদম সৃজিত হয়ে গেল এবং সৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর নাম সংক্রান্ত জ্ঞানে বিভূষিত হল, তখন) আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ (এবার) তোমরা আদমকে সিজদা কর। (এ হচ্ছে সম্মান সংক্রান্ত নিয়ামত)। তখন সবাই সিজদা করল ঃ ইবলীস বাদে, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ আমি যখন (নিজে) নির্দেশ দিয়েছি, তখন কিসে তোকে সিজদা করতে বারণ করল? সে বলল ঃ (যে বিষয়টি সিজদা করতে অন্তরায় হয়েছে, তা'হল এই যে,) আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর একে (আদমকে) আপনি মাটির দ্বারা তৈরী করেছেন। এ হচ্ছে শয়তানী যুক্তির প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশ---যা উল্লেখ করা হয়নি তা হল এই যে, আলোকময় হওয়ার কারণে আগুন মাটির চাইতে উত্তম। তৃতীয় অংশ এই যে, যে উত্তম তার অংশ তথা সন্তান-সন্ততি অনুত্তমের অংশ থেকে উত্তম। চতুর্থ

অংশ এই যে, অনুত্তমকে সিজদা করা উত্তমের পক্ষে অনুচিত। এ অংশ চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে শয়তান সিজদা না করার পক্ষে এ যুক্তি দাঁড় করাল যে, আমি উত্তম, তাই অনুত্তমকে সিজদা করিনি। কিন্তু প্রথম অংশটি বাদে অবশিষ্ট সবগুলো অংশই ভ্রান্ত। প্রথম অংশটি সাধারণ মানুষের বেলায় এ অর্থে শুদ্ধ যে, মানব সৃজনের প্রধান উপাদান হচ্ছে মাটি। যুক্তির অবশিষ্ট অংশগুলোর ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। কেননা, মাটির তুলনায় আগুনের আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে ; কিন্তু সব দিক দিয়ে আগুনকে শ্রেষ্ঠ বলা অমূলক দাবী বৈ নয়। এমনিভাবে যে শ্রেষ্ঠ, তার সন্তান-সন্ততির শ্রেষ্ঠত্বও সন্দেহযুক্ত বিষয়। হাজারো ঘটনা এর বিরুদ্ধে বিদ্যমান। সৎ লোকের সন্তান-সন্ততির অসৎ এবং অসৎ লোকের সন্তান-সন্ততিও সৎ হয়ে যায়। এমনিভাবে অধমকে শ্রেষ্ঠের পক্ষে সিজদা করা অনুচিত ---একথাটিও ভ্রান্ত। বিভিন্ন উপকারিতা দৃষ্টে এরূপ সিজদা করা মাঝে মাঝে উচিত বলেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ (তুই যখন এতই অবাধ্য, তখন) আকাশ থেকে নিচে নেমে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার নেই (বিশেষ করে আকাশে থেকে। যেখানে অনুগতদেরই স্থান রয়েছে) তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। (অর্থাৎ দূর হয়ে যা)। নিশ্চয় তুই (এ অহংকারের কারণে) অধমদের অন্তর্ভুক্ত (থেকে গিয়েছিস)। সে বলল ঃ আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দান করুন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেওয়া হল। সে বলল ঃ আপনি যেমন আমাকে (তাকবিনী হুকুম অনুযায়ী) বিভ্রান্ত করেছেন, আমি কসম খেয়ে বলছি, তেমনিভাবে আমি তাদের জন্য (অর্থাৎ আদম ও আদম সন্তানদের বিভ্রান্ত করার জন্য) আপনার সরল পথে (যার বাস্তব রূপ হচ্ছে সত্য দীন) বসে যাব। অতঃপর তাদেরকে (চতুর্দিক) থেকে আক্রমণ করব---সম্মুখ থেকেও, পেছন দিক থেকেও, তাদের ডানদিক থেকেও এবং বামদিক থেকেও (অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করব না---যাতে তারা আপনার ইবাদত করতে না পারে) আর (আমি আমার প্রচেষ্টায় সফলকাম হব। কাজেই) আপনি তাদের অধিকাংশকেই (আপনার নিয়ামতসমূহের প্রতি) কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ এখান থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে) লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বের হয়ে যা। (এবং আদম সন্তানদেরকে পথভ্রান্ত করার যে কথা তুই বলছিস, সে সম্পর্কে যা খুশী, তাই কর গিয়ে। আমি সব স্বার্থের উর্ধ্বে। কেউ পথপ্রাপ্ত হলেও আমার কোন লাভ নেই এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলেও আমার কোন ক্ষতি নেই)। তাদের মধ্যে যে তোর অনুগত হবে---নিশ্চয় আমি তোদের দ্বারা (অর্থাৎ ইবলীস ও তার অনুগতদের দ্বারা) জাহান্নামকে পূর্ণ করে দেব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারায় চতুর্থ রুকূতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবুল হয়েছে কি না। কবুল হয়ে থাকলে দুটি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান ঃ ইবলীস ঠিক

ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে ঃ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ—অর্থাৎ তোকে অবকাশ দেওয়া হল। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিত এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, না কি অন্য কোন মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ শব্দাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্র জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলীসের দোয়া কবূল হলেও আংশিক কবূল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

তফসীর ইবনে জরীরে সুদ্দী থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ

فلم ينظره الى يوم البعث ولكن انظره الى يوم الوقت المعلوم وهو يوم ينفخ فى الصور النفخة الاولى فصعق من فى السماوات ومن فى الارض فمات.....

আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে হাশর দিবস পর্যন্ত অবসর দেননি; বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

মোট কথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয় বার শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত, যখন সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবূল হলে যে সময় একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত কবূল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

ইবলীসের এ দোয়া ও كل من عليها فان (পৃথিবীস্থ সবকিছু ধ্বংসশীল) আয়াতের মধ্যে বাহ্যত যে পরস্পর বিরোধিতা ছিল, উপরোক্ত বিশ্লেষণের ফলে তাও বিদূরিত হয়ে গেল।

এই বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, يوم البعث (পুনরুত্থান দিবস) ও يوم الوقت المعلوم (নির্দিষ্ট দিবস) দু'টি পৃথক পৃথক দিন। ইবলীস يوم البعث পর্যন্ত অবসর চেয়েছিল। তা সম্পূর্ণ কবুল হয়নি, বরং একে পরিবর্তন করে يوم الوقت المعلوم অবসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি পৃথক পৃথক দিন। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় থেকে জান্নাত ও দোযখে প্রবেশ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ দিন হবে। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হবে। এসব বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্ক রেখে এ দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে পারে; উদাহরণত একে يوم نفخ صور (শিঙ্গা ফুঁকার দিন) ও يوم فناء (ধ্বংসের দিন)-ও বলা যায় এবং يوم البعث (পুনরুত্থান দিবস) يوم جزاء (প্রতিদান দিবস) নামেও অভিহিত করা যায়। এতে সব খট্‌কা দূর হয়ে যায়।

কাফিরের দোয়াও কবুল হতে পারে কি ঃ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ এ আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, কাফিরের দোয়া কবুল হয় না; কিন্তু ইবলীসের এ ঘটনা ও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফিরের দোয়াও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফিরের দোয়াও কবুল হয়ে গেল। কিন্তু পরকালে কাফিরের দোয়া কবুল হবে না। উল্লিখিত আয়াত وما دعاء الكافرين الا فى ضلال পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আদম ও ইবলীসের ঘটনার বিভিন্ন ভাষা ঃ কোরআন মজীদে এ কাহিনী কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় প্রশ্ন ও উত্তরের ভাষা বিভিন্ন রূপ। অথচ ঘটনা একটিই। এর কারণ এই যে, আসল ঘটনা সর্বত্র একইরূপে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য বিষয়-বস্তু এক থাকার পর ভাষার বিভিন্নতা আপত্তির বিষয় নয়। কেননা, অর্থ ঠিক রেখে যে-কোন ভাষায় বর্ণনা করা দূষণীয় নয়।

আল্লাহ্‌র সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরূপে হল ঃ রাব্বুল ইযযত আল্লাহ্‌র মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রাসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হল? আলিমগণ বলেন ঃ এটাও আল্লাহ্ তা'আলার চূড়ান্ত গযবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্‌র রহমত

থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায় হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও প্রতাপকে ঢেকে দেয় এবং তার মধ্যে নির্লজ্জতা প্রবেশ করিয়ে দেয়।---(বয়ানুল কোরআন ঃ সংক্ষেপিত)

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়—আরও ব্যাপক ঃ আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারিটি দিক বর্ণনা করেছে —অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট করার আশংকা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে।

আলোচ্য আয়াতে শয়তানকে আকাশ থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ বাক্যে এবং দ্বিতীয় قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا বাক্যে। সম্ভবত প্রথম বাক্যে প্রস্তাব এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে।---(বয়ানুল কোরআন ঃ সংক্ষেপিত)

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ
لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا
عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا
ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ اهْبِطُوا

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

(১৯) হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি ; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও—কিংবা হয়ে যাও এখানকারই চিরকালীন বাসিন্দা। (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) অতঃপর প্রতারণা পূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের শত্রু ? (২৩) তারা উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফল-ভোগ আছে। (২৫) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি আদমকে নির্দেশ দিলাম ঃ) হে আদম (আ)! তুমি এবং তোমার সহধর্মিনী (হাওয়া) জান্নাতে বসবাস কর। অতঃপর যেখান থেকে ইচ্ছা (এবং যা ইচ্ছা) উভয়ে ভক্ষণ কর। তবে (এতটুকু মনে রেখো যে,) এ (বিশেষ) বৃক্ষটির কাছে (ও) যেয়ো না, (অর্থাৎ এর ফল খেয়ো না) অন্যথায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা অন্যায়াচরণ করে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যাতে (তাদেরকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে খাইয়ে) তাদের আবৃত অঙ্গ যা উভয়ের কাছে গোপন ছিল, উভয়ের সামনে প্রকাশ করে দেয়। কেননা, এ বৃক্ষ ভক্ষণের এটাই ছিল প্রতিক্রিয়া ---নিজ সত্তার দিক দিয়ে---অথবা নিষেধাজ্ঞার কারণে। (এবং কুমন্ত্রণা ছিল এই যে, সে) বলল ঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষের (ফল ভক্ষণ) থেকে অন্য কোন কারণে নিষেধ করেননি ; বরং শুধু এ কারণে যে, তোমরা

উভয়ে (এর ফল খেয়ে) কখনো না ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা কোথাও চিরকাল বসবাস-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও! (কুমন্ত্রণার সারমর্ম ছিল এই যে, এ বৃক্ষ খেলে ফেরেশতা-সুলভ শক্তি এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু প্রথমদিকে তোমরা এ শক্তি-শালী খাদ্য সহ্য করতে সক্ষম ছিলে না। তাই নিষেধ করা হয়েছিল। এখন তোমাদের অবস্থা ও শক্তি অনেক উন্নত। তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একে সহ্য করার ক্ষমতা হয়ে গেছে। কাজেই পূর্বের নিষেধাজ্ঞা আর বাকী নেই)। এবং (শয়তান) তাদের উভয়ের সামনে (এবিষয়ে) শপথ করল যে, নিশ্চিত বিশ্বাস করুন, আমি আপনাদের উভয়ের (আন্তরিক) হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর (এমন সব কথা বলে) উভয়কে প্রতারণা পূর্বক নিচে নামিয়ে দিল। (নিচে নামানো অবস্থা ও মতের দিক দিয়েও ছিল। তারা নিজস্ব মত ত্যাগ করে শত্রুর মতের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অবস্থানের দিক দিয়েও নামানো ছিল। কারণ, জান্নাত থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। অতএব তারা বৃক্ষ আস্বাদন করতেই (তৎক্ষণাৎ) উভয়ের আবৃত অঙ্গ পরস্পরের সামনে খুলে গেল (অর্থাৎ জান্নাতের পোশাক খুলে গেল এবং লজ্জিত হল) এবং (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়ে নিজের (দেহের) উপর জান্নাতের (বৃক্ষের) পাতা মিলিয়ে মিলিয়ে রাখতে লাগল এবং (তখন) তাদের পালনকর্তা তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের উভয়কে এ বৃক্ষ (খাওয়া) থেকে নিষেধ করিনি এবং একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (এর প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকবে)? উভয়ে বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের বড় ক্ষতি করেছি। (পুরো-পুরি সতর্ক হইনি এবং চিন্তা-ভাবনা করিনি), যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ্ তা'আলা (আদম ও হাওয়াকে) বললেন ঃ তোমরা (জান্নাত থেকে) নিচে (পৃথি-বীতে) নেমে যাও---তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের সন্তান-সন্ততি) পরস্পরে একে অন্যের শত্রু হয়ে থাকবে এবং তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বসবাসের স্থান (নির্ধারিত) রয়েছে এবং (জীবিকার উপায়াদি দ্বারা) ফলভোগ করা (নির্ধারিত) রয়েছে বিশেষ সময় পর্যন্ত। (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত)। তিনি (আরও) বললেন ঃ তোমরা সেখানেই জীবন অতি-বাহিত করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই (কিয়ামতের দিন) পুন-রুত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূতে বিশদ বর্ণনাসহ উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর, পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকারার তফসীরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ
حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(২৬) হে বনি-আদম! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক,—এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে এমতাবস্থায় যে, তাদের পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে—যাতে তাদেরকে লজ্জাস্থান দেখিয়ে দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আদম সন্তানগণ! (আমার এক নিয়ামত এই যে,) আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা তোমাদের সতরকেও (অর্থাৎ গুপ্ত অঙ্গকে) আচ্ছাদিত করে এবং (তোমাদের দেহকে) সুসজ্জিতও করে এবং (এ বাহ্যিক পোশাক ছাড়া একটি অন্তরগত পোশাকও তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি, যা) তাক্‌ওয়ার (অর্থাৎ ধর্মপরায়ণতার পোশাকও)। এটি (বাহ্যিক পোশাক থেকে) উত্তম (ও বেশী জরুরী)। (কেননা, ধর্মপরায়ণতার একটি অঙ্গ হিসাবেই বাহ্যিক পোশাকও শরীয়তে কাম্য—আসল উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় ধর্মপরায়ণতার পোশাকই) এটি (অর্থাৎ পোশাক সৃষ্টি করা) আল্লাহ্ তা'আলার (কৃপা ও অনুগ্রহের) নিদর্শনাবলীর অন্যতম যাতে তারা (এ নিয়ামতকে) স্মরণ করে (এবং স্মরণ করে নিয়ামতদাতার যথার্থ আনুগত্য করে। যথার্থ অনুগত্যকেই ধর্মপরায়ণতার পোশাক বলা হয়েছে)। হে আদম সন্তানেরা! শয়তান যেন তোমাদেরকে কোন অনিষ্টে না ফেলে (অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা ধর্ম ও তাকওয়ার বিপরীত কোন কাজ না করায়)। যেমন, সে তোমাদের দাদা-দাদীকে (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া [আ]-কে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের দ্বারা এমন কাজ করিয়েছে, যার ফলে তারা জান্নাত থেকে বের হয়ে গেছে এবং বেরও) এমন অবস্থায় (করিয়েছে) যে, তাদের পোশাকও তাদের (দেহ) থেকে খুলিয়ে দিয়েছে—যাতে উভয়কে উভয়ের গুপ্তাঙ্গ দেখিয়ে দেয়। (যা সাধারণ রুচিবান লোকের জন্যও অত্যন্ত লজ্জাকর ও অপমানকর ব্যাপার। মোট কথা, শয়তান তোমাদের পুরাতন শত্রু। তার থেকে খুব সাবধান থাক। বেশী সাবধানতা এজন্য আরও জরুরী যে) সে এবং তার দলবল এমনভাবে তোমাদেরকে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে (সাধারণত) দেখ না। (নিঃসন্দেহে এরূপ শত্রু অত্যন্ত মারাত্মক। এ থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া উচিত। পূর্ণ ঈমান ও তাকওয়া দ্বারাই তা

অর্জিত হয়। ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেননা,) আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু হতে দেই, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। (যদি ঈমান মোটেই না থাকে, তবে শয়তান পুরোপুরি তাকে কাবু করে নেয়। পক্ষান্তরে যদি ঈমান থাকে অপূর্ণ, তবে তদপেক্ষা কম কাবু করে। এর বিপরীতে পূর্ণ মু'মিনের উপর শয়তানের কোন বশ চলে না। যেমন কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকূতে আদম (আ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমাদের পোশাক আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সাম্বোধন করা হয়নি---সমগ্র বনী আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ—এখানে يوارى শব্দটি مواراة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা। سَوْآت শব্দটি سَوْءَة-এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবগতভাবেই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَرِيشًا—সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তদ্দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার।

কোরআন পাক এ স্থলে أَنْزَلْنَا অর্থাৎ 'অবতারণ করা' শব্দ ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য, দান করা। এটা জরুরী নয় যে, আকাশ থেকে তৈরী পোশাক অবতীর্ণ হবে।

যেমন অন্যত্র أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোহা অবতারণ করেছি। অথচ লোহা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে বের হয়। উভয়স্থলে أَنْزَلْنَا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন মানুষের কোন কলাকৌশল ও কারিগরির প্রভাব থাকে না, তেমনি পোশাকের আসল উপাদান তুলা বা পশমের মধ্যে কোন মানবীয় কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও প্রভাব নেই। এটা একান্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দান। তবে এগুলো দ্বারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য পছন্দসই পোশাক তৈরী করার মধ্যে মানবীয় কারিগরি অবশ্যই কাজ করে। এ কারিগরিও আল্লাহ্ তা'আলারই এমন দান, যার মূল সূত্র আল্লাহ্র তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা ঃ আয়াতে পোশাকের দু'টি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। এক. গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং দুই. শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গসজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষাই নয়, অঙ্গসজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম-হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা ঃ মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ঃ শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরীয়তে গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা ইত্যাদি সবই এর পরবর্তী করণীয়।

হযরত ফারূকে আযম (রা) বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ

مَا أُوَارِيْ بِهٖ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهٖ فِيْ حَيَاتِيْ—অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্তাঙ্গ আবৃত করি এবং সাজসজ্জা করি।

নতুন পোশাক তৈরীর সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার সওয়াব ঃ তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে চলে আসে। ---(ইবনে কাসীর)

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষের স্বভাবগত কর্ম। ক্রমোন্নতির নতুন দর্শন ভ্রান্ত ঃ আদম (আ)-এর ঘটনা এবং কোরআন পাকের এ বক্তব্য থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, গুপ্ত অঙ্গ আচ্ছাদন এবং পোশাক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং জন্মগত প্রয়োজন। প্রথম দিন থেকেই এটি মানুষের সাথে রয়েছে। আজকালকার কোন কোন দার্শনিকের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন যে, মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরা-ফেরা করত ; অতঃপর ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোশাকের একটি তৃতীয় প্রকার ঃ গুপ্ত অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ-সজ্জার জন্য দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে ঃ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোন কোন কিরা-আতে যবর দিয়ে لِبَاسَ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় انزلنا এর مفعول হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি, প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীরুতাকে বোঝানো হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্য আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌ভীরুতারও একটি অন্তরগত পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। একারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ভীতি ও সৎ কর্মবিহীন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যত

পর্দার ভিতরেই আত্মগোপন করুক না কেন, পরিণামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। ইবনে জরীর হযরত উসমান (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ---যে ব্যক্তি কোন কাজ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সে কাজের চাদর পরিধান করিয়ে তা প্রমাণ করিয়ে দেন। সৎ কাজ হলে সৎ কাজের কথা এবং অসৎ কাজ হলে অসৎ কাজের কথা প্রকাশ করেন। 'চাদর পরিধান করানোর' অর্থ এই যে, দেহে পরিহিত চাদর যেমন সবার দৃষ্টির সামনে থাকে, তেমনি মানুষের কাজ যতই গোপন হোক না কেন, তার ফলাফল ও চিহ্ন তার মুখমণ্ডল ও দেহে আল্লাহ তা'আলা ফুটিয়ে দেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে রসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

বাহ্যিক পোশাকেরও আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা ঃ لِبَاسُ التَّقْوٰى

শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ও সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্ভীতি। এ আল্লাহ্ভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুসরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসত্ত্বেও পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ—অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম—যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে না দেয় ; যেমন তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ

أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ -

এখানে قبيل শব্দের অর্থ দলবল। এক পরিবারভুক্ত দলকে قبيلة বলা হয় এবং সাধারণ দলকে قسط বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান তোমাদের এমন শত্রু যে, সে এবং তার দলবল তো তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না। কাজেই তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা তোমাদের উপর কার্যকরী হওয়ার আশংকা বেশী।

কিন্তু অন্যান্য আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে এবং শয়তানী চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকে, তাদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত অন্যন্ত দুর্বল।

এ আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে ঃ আমি শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করি, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই কঠিন নয়।

কোন কোন মনীষী বলেছেন ঃ যে শত্রু আমাদেরকে দেখে এবং আমরা তাকে দেখি না, আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করাই তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ্ পাক শয়তান ও তার দলবলের গতিবিধি দেখেন ; কিন্তু শয়তানরা তাঁকে দেখে না।

মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না---একথাটি সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অলৌকিকভাবে কোন মানুষ শয়তানকে দেখলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জ্বিনদের আগমন করা, প্রশ্ন করা, ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾
فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ يَا بَنِي
آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

(২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে ঃ আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহ্‌র প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না? (২৯) আপনি বলে দিন ঃ আমার পালনকর্তা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। (৩০) তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে। একদলকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। (৩১) তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও—খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে, (অর্থাৎ যা সুস্পষ্ট মন্দ কাজ এবং মানব স্বভাব যাকে মন্দ মনে করে; যেমন উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা) তখন বলে ঃ আমরা স্বীয় বাপ-দাদাকে এ পথে পেয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদেরকে তাই বলেছেন। (হ রসূল, [সা] তাদের মূর্খতাসুলভ যুক্তির প্রত্যুত্তরে) আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজ শিক্ষা দেন না। তোমরা কি (এরূপ দাবী করে) আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করছ, যার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। আপনি (আরও) বলে দিন ঃ (তোমরা যেসব অশ্লীল ও ভ্রান্ত কাজের নির্দেশকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছ, সেগুলো তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা বাস্তবিক কি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, এখন তাই শোন। তা এই যে) আমার পালনকর্তা সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই যে, নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা প্রত্যেক সিজদার (অর্থাৎ ইবাদতের) সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা (আল্লাহ্‌র দিকে) রাখ। (অর্থাৎ ইবাদতে যেন কোন সৃষ্টবস্তুকে অংশীদার না কর) এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতকে খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্যেই রাখ। (এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে শরীয়তের সব আদিষ্ট বিষয় সংক্ষেপে এসে গেছে ঃ সুবিচার শব্দে বান্দার হক, أقيموا অংশে কর্ম ও ইবাদতের এবং مخلصين শব্দে ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে)। তোমাদেরকে তিনি প্রথমবার যেরূপ সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমরা (এক সময়ে) পুনরায় সৃজিত হবে। এক দলকে আল্লাহ্ তা'আলা (দুনিয়াতে) পথ প্রদর্শন করেছেন (তারা তখন প্রতিদান পাবে) এবং এক দলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে, (তারা তখন শাস্তি পাবে) নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং (এতদসত্ত্বেও নিজেদের সম্পর্কে) ধারণা করে যে, তারা সৎপথে আছে। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় (নামাযের জন্য হোক কিংবা তওয়াফের জন্য) স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং (পোশাক বর্জন যেমন গোনাহ্, হালাল বস্তুর পানাহার অবৈধ মনে করাও তেমনি গোনাহ্। এজন্য হালাল বস্তু)

তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর এবং শরীয়তের সীমা লংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কাবা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কোরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। (এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশী বেআদবীর কাজ। হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল)।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছেঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলতঃ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরীকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও বলতঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ-কেই বোঝানো হয়েছে। فحش, فحشاء ও فاحشة এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট।---(মাযহারী)

এ স্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত।---(রূহুল-মা'আনী)

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। এক. বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ বাপ-দাদার তরীকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরীকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদারা এরূপ করত। কেননা, বাপ-দাদার তরীকা হওয়া যদি কোন তরীকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরীকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরীকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়।

মোট কথা মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রূক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পাক এখানে এর উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোন মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ—অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।' কেননা এরূপ নির্দেশ দেয়া আল্লাহ্র প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থী। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে ঃ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ—অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা قسط-এর নির্দেশ দেন। قسط-এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমায় লংঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত শরীয়তের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাকল্য বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।----(রূহুল মা'আনী)

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক. اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ-এবং দুই. وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ—প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে مسجد শব্দটি সিজদা ও ইবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক

ইবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে পালনকর্তার নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্য হবে না; বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়, এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে। এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা ব্যাহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না। বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্র জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরী। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন দোষ নেই। বলাবাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবত এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يعيدكم এর পরিবর্তে تعودون বলেছেন। অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। ---(রূহুল মা'আনী)

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরীয়তের বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কেননা, পরকাল ও কিয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ একদল লোককে তো আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা

আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে; অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র হিদায়ত যদিও সবার জন্যে ছিল; কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হিদায়ত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে--- যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার্হ হওয়া উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার ক্ষমার্হ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযযালী (র) "আত্তাফরেকাতু বাইনাল ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ্" গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর--- সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহিলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করত, তেমনি তারা হজ্বের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত।--(ইবনে জরীর)

তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বেআদবী বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্ম কাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালংঘন।

আল্লাহ্ তা'আলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজ্জের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর; তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্জের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহিলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহ্র গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফিকহ্বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বিশেষ ঘটনায় কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয ঃ তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম---উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الطواف بالبيت صلوة (বায়তুল্লাহ্র তওয়াফও এক প্রকার নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীরবিদগণের মতে যখন مسجد বলে সিজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সিজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সিজদায় যখন নিষিদ্ধ হল, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায জায়েয নয়।--(তিরমিযী)

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ঃ يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ—অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা আবরু ঢাকতে পার।

মোটকথা এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্য প্রথম মানবিক ও ইসলামী ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরয।

নামাযের জন্য উত্তম পোশাক ঃ আয়াতের দ্বিতীয় মাস'আলা, পোশাককে زِيْنَت (সাজসজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এতদসঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করা কর্তব্য।

হযরত হাসান (রা) নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাই আমি পালনকর্তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন ঃ

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

অর্থাৎ তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ কর। বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে **সতর** আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়।

নামাযের পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাস'আলা ঃ আয়াতের তৃতীয় মাস'আলা, যে **সতর** সর্বাবস্থায় বিশেষত নামায ও তওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কত-টুকু? কোরআন পাক সংক্ষেপে **সতর** আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের **সতর** নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের **সতর** মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাভীর নিচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্য এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু বা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতেও নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল **সতরের** বাইরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহ্রাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরীয়ত-সম্মত ওযর ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘোরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে **সতরের** ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। নামাযে শুধু **সতর** আবৃত করা কাম্য নয় ; বরং সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামায পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরূহ! হাফসার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক---সর্বাবস্থায় মাকরূহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরূহ, যা পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয় ; যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া, যদিও আস্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা ছোট হাত-রুমাল বেঁধে নামায পড়া। কারণ, রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ্র দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামায

পড়া যে মাকরূহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زِينَت (সাজসজ্জা) শব্দ থেকে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাস'আলাও জানা গেছে; এমনিভাবে দ্বিতীয় كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا বাক্যটিও আরবদের হজ্জের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ্ মনে করার কুপ্রথা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকতাদৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাস'আলা প্রমাণিত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরয ঃ প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরয ও জরুরী। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহ্র কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না ঃ আহ্কামুল-কোরআন-জাস্সাসের বর্ণনা মতে এ আয়াত থেকে একটি মাস'আলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধ ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। كُلُوا وَاشْرَبُوا বাক্যে مفعول অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন ঃ এরূপ স্থলে مفعول উল্লেখ না করে مفعول-এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার--ঐসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালংঘন বৈধ নয় ঃ আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারে অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত اسراف শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। সীমালংঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে।

এক. হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালংঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

দুই. আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্র আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্।--(ইবনে কাসীর, মাযহারী, রূহুল আ'আনী)

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য।

তাই ফিকহ্‌বিদগণ উদরপূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েয লিখেছেন। (আহকামুল-কোরআন) এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা—এটাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার

অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

অর্থাৎ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে—প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্যপন্থাই দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী ঃ হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ বেশী পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে মুক্ত। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্থূলদেহী আলিমকে পছন্দ করেন না (অর্থাৎ যে বেশী পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী হয়)। আরও বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দান করে।—(রূহুল মা'আনী)

মানুষ সদা-সর্বদা পানাহারের চিন্তায়ই মশগুল থাকবে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের উপর একে অগ্রাধিকার দেবে, যাতে মনে হবে যে, পানাহার করাই যেন জীবনের লক্ষ্য—পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়টিকেও অপব্যয় হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁদেরই একজনের প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে যে ঃ

خوردن برائے زیستن ست - نہ زیستن برائے خوردن

অর্থাৎ খাওয়া বেঁচে থাকার জন্য, বেঁচে থাকা খাওয়ার জন্য নয়।

কোন বস্তু খেতে মন চাইলে তা অবশ্যই খেতে হবে—এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) একেও অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য করেছেন। ان من الاسراف ان تاكل كل ما اشتهيت অর্থাৎ যা মন চায়, তাই খাওয়াও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।—(ইবনে মাজাহ)

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'বার খেতে দেখে বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্যপন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ যা ইচ্ছা পানাহার এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। এক. তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং দুই. গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাস'আলা ঃ মোট কথা এই যে, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্য থেকে আটটি মাস'আলার উদ্ভব হয়। এক. যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরয। দুই. শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। তিন. আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। চার. যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। পাঁচ. পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েয। ছয়. এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সাত. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। আট. মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

এই হচ্ছে এ আয়াতের ধর্মীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াদি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থাপত্র আর একটিও নেই। পানাহারে সমতা সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকার সর্বোত্তম পন্থা।

তফসীর রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, খলীফা হারুনুর রশীদের একজন খৃস্টান ডাক্তার ছিল। সে আলী ইবনে হোসাইনের কাছে বলল ঃ তোমাদের কোরআনে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিষয় বর্ণিত নেই, অথচ পৃথিবীতে দু'টি শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র ঃ এক. ধর্মশাস্ত্র এবং দুই. দেহশাস্ত্র। দেহশাস্ত্রই হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্র। আলী ইবনে হোসাইন বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গোটা চিকিৎসাশাস্ত্রকে কোরআনের একটি আয়াতের অর্ধাংশের মধ্যে ভরে দিয়েছেন। সে অর্ধেকখানা আয়াত এই ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا (তফসীর ইবনে কাসীরে এ উক্তি জনৈক পূর্ববর্তী মনীষী থেকেও বর্ণিত আছে।) অতঃপর সে বলল ঃ আচ্ছা, তোমাদের রসূল (সা)-এর বাণীতেও কি চিকিৎসা সম্পর্কে কোন কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকটি বাক্যে সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ পাকস্থলী রোগের আকর। ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক চিকিৎসার মূল। দেহকে সেসব বস্তু সরবরাহ কর, যাতে সে অভ্যস্ত। (কাশশাফ, রূহ) খৃস্টান চিকিৎসক একথা শুনে বলল ঃ তোমাদের কোরআন এবং তোমাদের রসূল জালিনূসের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন সূত্র আর বাকী রাখেন নি।

বায়হাকী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ পাকস্থলী হল দেহের চৌবাচ্চা। দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা এ চৌবাচ্চা থেকে সিক্ত হয়। পাকস্থলী সুস্থ হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা এখান থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিয়ে ফিরবে এবং পাকস্থলী দূষিত হলে সমস্ত শিরা-উপশিরা রোগব্যাধি নিয়ে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়বে।

হাদীসবিদগণ এসব হাদীসের ভাষা নিয়ে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু কম আহার ও সাবধানতার প্রতি অসংখ্য হাদীসে যে জোর দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সবাই একমত।---(রূহুল মা'আনী

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ
قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ
سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

(৩২) আপনি বলুনঃ আল্লাহ্র দেয়া সাজসজ্জাকে—যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুনঃ এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে। (৩৩) আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন—যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ্ অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত পরিধেয়, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহকে

প্রমাণহীন বরং প্রমাণ বিরুদ্ধভাবে হারাম মনে করেছে, তাদেরকে) আপনি বলে দিন ঃ (বল) আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুসমূহকে, যেগুলো তিনি স্বীয় বান্দাদের (ব্যবহারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পানাহারের হালাল বস্তুসমূহকে, (যেগুলো আল্লাহ্ হালাল করেছেন) কে হারাম করেছে ? (অর্থাৎ হালাল ও হারাম করা তো সৃষ্টিকর্তার কাজ, তোমরা নিজের পক্ষ থেকে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণাকারী কে ? আলোচ্য আয়াতে পোশাক ও পানাহারের বস্তুসমূহকে আল্লাহ্র নিয়ামত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে কাফিররা সন্দেহ করতে পারত যে, আমরা তো এসব নিয়ামত যথেষ্ট পরিমাণেই পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদের প্রতি নারাজই হবেন এবং আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের বিরুদ্ধে থাকবেন, তবে এসব নিয়ামত আমাদের পাওয়ার কোন কথাই ছিল না। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে ঃ হে মুহাম্মদ,) আপনি বলে দিন ঃ (আল্লাহ্র নিয়ামত ব্যবহার করার অনুমতি দানই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক নয়। তবে যে ব্যবহারের পর কোন শাস্তি ভোগ করতে না হয়, সেটা অবশ্য প্রিয়পাত্র হওয়ার পরিচায়ক। এরূপ ব্যবহার একমাত্র মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা কাফিররা যত বেশী পার্থিব নিয়ামত ভোগ করে, তার পরকালীন আযাব তত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই বলা হয়েছে,) এসব বস্তু (অর্থাৎ পোশাক ও পানাহারের বস্তুসমূহ) কিয়ামতের দিন (পঙ্কিলতা ও আযাব থেকে) মুক্ত থাকা অবস্থায় পার্থিব জীবনে বিশেষভাবে মু'মিনদেরই জন্য। (কাফিররা এর ব্যতিক্রম। দুনিয়াতে তারা যদিও আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগ করে বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করে, কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করার কারণে কিয়ামতের দিন এগুলো শাস্তি ও আযাবে পরিণত হবে)। আমি এমনিভাবে অভিজ্ঞ লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করি। আপনি (তাদেরকে আরও) বলে দিন ঃ (তোমরা যে হালাল বস্তুকে অহেতুক হারাম মনে করে রেখেছ, সেগুলো আল্লাহ্ হারাম করেন নি)। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র সেসব বস্তু হারাম করেছেন, যেগুলোর অধিকাংশে তোমরা লিপ্ত রয়েছ (উদাহরণত) সব অশ্লীল বিষয়---তন্মধ্যে যা প্রকাশ্য তাও (যেমন উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা) এবং যা গোপন তাও। (যেমন ব্যভিচার) এবং প্রত্যেক পাপাচার (হারাম করেছেন) এবং অন্যায়ভাবে কারও প্রতি জুলুম করা (হারাম করেছেন) এবং (হারাম করেছেন) এ বিষয় যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে এমন কোন বস্তুকে (ইবাদতে) শরীক করবে, যার কোন সনদ (ও প্রমাণ) আল্লাহ্ (পূর্ণ বা আংশিক কোনভাবেই) নাযিল করেন নি। এবং (এ বিষয় হারাম করেছেন) যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করবে, তোমাদের কাছে যার কোন প্রমাণ নেই। قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ আয়াতে যেমন সমস্ত আদিষ্ট ও শরীয়তসম্মত বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, তেমনি اِنَّمَا حَرَّمَ আয়াতে যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা হজ্জের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে ইবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসানোর ভংগিতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহ্র زِينَت অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য কে হারাম করেছে?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয়ঃ উদ্দেশ্য এই যে, কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয় যারা আল্লাহ্র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয়; যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) চার শ' গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালিক (র) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বস্ত্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না; মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরীঃ এক. রিয়া ও নামযশ এবং দুই. গর্ব ও অহংকার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষিগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা) এবং আরও কয়েকজন সাহাবীর মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীনকে দান ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল—যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সূফী বুযুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা সওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে আত্মার চিকিৎসা ও অহংবোধের প্রতিকারার্থ এ ধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুযুর্গই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য অধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র সুন্নত ঃ খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা), সাহাবী ও তাবেয়ীদের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য। তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনেশুনে খারাপ করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে লাগা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মু'মিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র---প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে আল্লাহ্র রীতি এই যে, মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করালগ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত

নিয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে ঃ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ আপনি বলে দিন ঃ সব পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মু'মিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না—এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মু'মিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফির ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নিয়ামত তারাও পায় বরং আরও বেশী পায়; কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে, কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা ও নানা রকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যাঁরা এসব নিয়ামত লাভ করবেন, তাঁরা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবেন। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা এবং কোন চিন্তাভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়। ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন—এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহ্‌র গযব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দুকূলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

অর্থাৎ যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছ, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন---তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপ কাজ, অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই।

এখানে إثم (পাপ কাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بغى (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গোনাহ্ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ---এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

এ বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করার কারণ দ্বিবিধঃ এক. এতে প্রায় সব রকম হারাম কাজ ও গোনাহ পুরোপুরি এসে গেছে---তা বিশ্বাসগত হোক কিংবা কর্মগত, ব্যক্তিগত কর্মের গোনাহ হোক কিংবা অপরের অধিকার হরণ সম্পর্কিত হোক। দুই. জাহিলিয়াত যুগের আরবরা এসব অপরাধ ও হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে তাদের মূর্খতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তারা হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকে এবং হারাম বস্তু ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধর্মে বাড়াবাড়ি এবং স্বকল্পিত বিদ'আতের এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে, যে ব্যক্তি এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে ধর্মের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে স্বভাবতই গাফিল হয়ে যায়। তাই বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের ক্ষতি দ্বিমুখী হয়ে থাকে। এক. স্বয়ং বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া গোনাহ এবং দুই. এর বিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম ও সুন্নত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয়---উভয় আয়াতে মুশরিকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। এক. হালালকে হারাম করা এবং দুই. হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্বপ্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধী-দেরকে কৃপাবশত অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে কোন রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে এ অবকাশেরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, তখন এক মুহূর্তও আগপাছ হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলেঃ মূল্য কিছু কম-বেশী হতে পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশী মূল্য তার কাম্য নয়--কম হবে কি না, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশীও উল্লেখ করা হয়। এমনি-ভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ
اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اُولٰٓئِكَ
يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ
قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا
وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝ قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ
اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۭ كُلَّمَا
دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ
اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ

النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ
لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾

(৩৫) হে বনী আদম! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে---তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনায় তবে যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং সৎ কাজ অবলম্বন করে, তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৩৬) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তার প্রতি অহংকার করবে, তারাই দোযখী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। (৩৭) অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের আমলনামায় লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমনকি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্য পৌঁছে, তখন তারা বলে ঃ তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমার আল্লাহ ব্যতীত আহবান করতে? তারা উত্তর দিবে ঃ আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে। তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফির ছিল। (৩৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের পূর্বে জ্বিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে, তখন তারা অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; কিন্তু তোমরা জান না। (৩৯) পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে ঃ তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্বাদন কর স্বীয় কর্মের কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি আত্মাজগতেই বলে দিয়েছিলাম ঃ) হে আদম সন্তানরা! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করে তোমাদেরকে আমার নির্দেশাবলী বর্ণনা করে, তবে (তাদের আগমনে) যে ব্যক্তি (তোমাদের মধ্যে নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলা থেকে) সংযত হবে এবং (কাজকর্ম) সংশোধন করে নেবে (অর্থাৎ পূর্ণরূপে অনুসরণ করবে), তাদের (পরকালে) কোনরূপ আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না এবং যারা (তোমাদের মধ্য থেকে) আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলবে এবং তা (কবুল করা) থেকে অহংকার করবে, তারা দোযখী হবে (অর্থাৎ দোযখের অধিবাসী হবে) এবং তারা তথায় চিরকাল থাকবে। মিথ্যারোপকারীদের কঠোর শাস্তিযোগ্য হওয়ার কথা যখন সংক্ষেপে জানা গেল, তখন বিস্তারিত বিবরণ শোন যে, ঐ ব্যক্তির চাইতে কে অধিক জালিম হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করে (অর্থাৎ

যে কথা আল্লাহ্ বলেন নি, তা আল্লাহ্ বলেছেন বলে), অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ যে কথা আল্লাহ্ বলেছেন তা আল্লাহ্ বলেন নি বলে), তাদের অংশের যা কিছু (রিযিক ও বয়স) আছে, তা তারা (দুনিয়াতে) পেয়ে যাবে (কিন্তু পরকালে বিপদই বিপদ রয়েছে)। এমনকি, (মৃত্যুর সময় বরযখে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করতে আসবে, তখন (তাদেরকে) বলবে ঃ (বল) তারা কোথায় গেল, আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদের তোমরা আরাধনা করতে? (এ বিপদ মুহূর্তে তারা কাজে আসে না কেন)? তারা (কাফিররা) বলবে ঃ আমাদের কাছ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে (অর্থাৎ বাস্তবিকই তারা উপকারে আসেনি)। এবং (তখন) তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল। (কিন্তু তখনকার স্বীকারোক্তি হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কোন কোন আয়াতে এ ধরনেরই প্রশ্নোত্তর কিয়ামতেও হবে বলে বর্ণিত আছে। অতএব, উভয় ক্ষেত্রে হওয়াও সম্ভবপর। কিয়ামতে তাদের অবস্থা হবে এই যে,) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের পূর্বে জ্বিন ও মানবের যেসব (কাফির) সম্প্রদায় অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও (আগে-পিছে সব কাফির তাতে প্রবেশ করবে এবং অবস্থা হবে এই যে,) যখনই (কাফিরদের) কোন সম্প্রদায় (দোযখে) প্রবেশ করবে, তাদের মত অন্য সম্প্রদায়কে (যারা তাদের মতই কাফির হবে এবং তাদের পূর্বে দোযখে প্রবিষ্ট হবে) অভিসম্পাত করবে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি থাকবে না ; সবকিছুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার কারণে একে অন্যকে কুনজরে দেখবে এবং মন্দ বলবে) এমনকি, যখন তাতে (অর্থাৎ সেই দোযখে) সবাই একত্রিত হয়ে যাবে, তখন পরবর্তীরা (যারা পরে প্রবেশ করে থাকবে এবং এরা হবে ঐ লোক, যারা কুফরে অন্যের অনুসারী ছিল) পূর্ববর্তী (প্রবেশকারীদের) সম্পর্কে (অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে, যারা নেতা ও সর্দার হওয়ার কারণে পূর্বে দোযখে প্রবেশ করবে, একথা) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! এরা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, তাদেরকে দোযখের শাস্তি (আমাদের চাইতে) দ্বিগুণ প্রদান করুন। আল্লাহ্ বলবেন ঃ (তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিলে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার কি আছে ; বরং তোমাদের শাস্তিও সর্বদা পলে পলে বৃদ্ধি পাবে। তাই তোমাদের শাস্তিও তাদের দ্বিগুণ শাস্তির মতই হবে। অতএব এই হিসাবে) সবারই (শাস্তি) দ্বিগুণ; কিন্তু (এখনও) তোমরা (পুরোপুরি) জান না। (কারণ, এখন আযাবের মাত্র সূচনা। পরবর্তী ক্রমবৃদ্ধি তোমরা এখনও দেখনি। তাই অমন কথা বলছ। এতে বোঝা যায় যে, অন্যের শাস্তি বৃদ্ধিকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্রোধ নিবারক ও সান্ত্বনাদায়ক মনে করছ,) এবং পূর্ববর্তী (প্রবেশকারী)-রা পরবর্তী (প্রবেশকারী)-দেরকে (আল্লাহ্ তা'আলার উত্তর অবগত হয়ে) বলবে ঃ (যখন সবার শাস্তির এ অবস্থা) তাহলে আমাদের উপর তোমাদের (লঘু শাস্তির ব্যাপারে) কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (কেননা, আমাদের শাস্তিও লঘু নয়, তোমাদের শাস্তিও লঘু নয়)। অতএব তোমরাও স্বীয় (কু-) কর্মের কারণে (অধিক শাস্তিই) আস্বাদন কর।

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ط

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ
غَوَاشٍ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا
خٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰنَا لِهٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ
وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

(৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪১) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালিমদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশী বোঝা দিই না--তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের পালনকর্তার রসূল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবেঃ এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ হচ্ছে কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা। এখন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অবস্থা শুনুন)ঃ যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে এবং তা মেনে নিতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, (মৃত্যুর পর) তাদের (আত্মার ঊর্ধ্বগমনের) জন্য আকাশের দ্বার খোলা হবে না। (এ হচ্ছে মৃত্যুর পর বরযখের অবস্থা)। এবং (কিয়ামতের দিন) তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উষ্ট্র প্রবেশ করে। (এটা অসম্ভব, কাজেই তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব)। এবং আমি অপরাধীদেরকে এমনি সাজা প্রদান করি (অর্থাৎ আমার কোন শত্রুতা নেই। যেমন কর্ম, তেমনি ফল। পূর্বে তাদের দোযখে

যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দোযখের আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং অবস্থা হবে এই যে,) তাদের জন্য নরকাগ্নির শয্যা হবে এবং তাদের উপর (এরই) চাদর হবে এবং আমি জালিমদেরকে এমনি শাস্তি প্রদান করি। (এসব জালিমের কথা فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।) এবং যারা (আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, (এ সৎ কাজ মোটেই কঠিন নয়। কেননা, আমার রীতি এই যে) আমি কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজ দিই না। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। মোট কথা,) তারাই জান্নাতের অধিবাসী (এবং) তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। (তাদের অবস্থা দোযখবাসীদের মত হবে না যে, সেখানেও একে অপরকে অভিসম্পাত করবে; বরং তাদের অবস্থা হবে এই যে) যা কিছু তাদের অন্তরে (কোন কারণবশত দুনিয়াতে স্বভাবগতভাবে) মালিন্য (ও দুঃখ) ছিল, আমি তা (-ও) অপসৃত করব। (ফলে তারা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার মধ্যে থাকবে)। তাদের (বাস-গৃহের) নিম্নে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে এবং তারা (আনন্দের আতিশয্যে) বলবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার (লাখ লাখ) শুক্‌রিয়া, যিনি আমাদেরকে এ স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও (এ পর্যন্ত) পৌঁছতে পারতাম না, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে না পৌঁছাতেন। (এতে একথাও বলা হয়ে গেছে যে, এ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঈমান ও সৎ কর্ম তিনিই আমাদেরকে বলে দিয়েছেন এবং তা মেনে চলার তৌফিক দিয়েছেন)। বাস্তবিকই আমাদের পালনকর্তার পয়গম্বরগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন। (সেমতে তাঁরা এসব কাজকর্মের ফলস্বরূপ জান্নাতের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে) এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে ঃ এ জান্নাত তোমাদেরকে দেওয়া হল তোমাদের (সৎ) কর্মের প্রতিদানে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই ঃ যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আযাব ও সওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মু'মিনদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছেঃ যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কোরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম 'ইল্লিয়্যীন' বলা হয়েছে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছেঃ

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ অর্থাৎ মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে। অর্থাৎ মানুষের সৎ কর্মসমূহ পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্‌র বিশেষ দরবারে পৌঁছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে-মাজা ও ইমাম আহমদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই ঃ

'রসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর চারদিকে চুপ চাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন ঃ মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে ঃ এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হত এবং বলে ঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে এবং দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রাখ এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে ঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত

হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলেঃ ইনি আল্লাহ্‌র রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফিরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদ্দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মু'মিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

মোট কথা, কাফিরদের আত্মা আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। ফলে সেখান থেকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, মৃত্যুর সময় তাদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না।

আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط -

يلج শব্দটি ولوج থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جمل-এর অর্থ উট এবং سم- এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট-বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ —— مهاد শব্দের অর্থ বিছানা এবং غواش শব্দটি

غَاشِيَةٌ—এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেষে كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ—বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ—বলা হয়েছে। কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে ঃ কিন্তু তাদের জন্য সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কৃপাবশত এ কথাও বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ সৎ কর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলা হয়েছে ঃ আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে ঃ চতুর্থ আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ—অর্থাৎ জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে

দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তফসীরে মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবী করা হবে, সেগুলো টাকা-পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকী থাকে, তবে প্রাপকের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে।

এ হাদীসে পাওনা পরিশোধ ও প্রতিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধুয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (রহ) কোরআন পাকের وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا আয়াতের তফসীরেও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানির দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা) একবার এ আয়াত পাঠ করে বললেন ঃ আমি আশা করি, ওসমান, তালহা ও যুবায়র ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিল না।

এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেষ্টাটুকুও তো তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে।

হিদায়তের বিভিন্ন স্তর ঃ ইমাম রাগিব ইস্পাহানী 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হিদায়ত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহ্র দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হিদায়ত। তাই আল্লাহ্র নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হিদায়তের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি এবং ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহ্মুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তর হিদায়ত। তাই হিদায়ত অন্বেষণ থেকে কখনও কোন মানব এমনকি নবী-রসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনের শেষ পর্যন্ত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্ন সহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, আল্লাহ্র নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমনকি, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হিদায়ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এটি হচ্ছে হিদায়তের সর্বশেষ স্তর।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا
حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۭ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰهُمْ ۚ
وَنَادَوْٓا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ
يَطْمَعُوْنَ ۝ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاۗءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ
رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ اَهٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝

(৪৪) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবেঃ আমাদের সাথে আমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের পালনকর্তার ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবেঃ হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত জালিমদের উপর, (৪৫) যারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত, তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৬) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আ'রাফের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবেঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৪৭) যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পড়বে, তখন বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এ জালিমদের সাথী করো না। (৪৮) আ'রাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে তাদেরকে ডেকে বলবেঃ তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জান্নাতে। তোমাদের কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (যখন জান্নাতীরা জান্নাতে পৌঁছে যাবে তখন) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে (নিজেদের অবস্থায় আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ও তাদের পরিতাপ বৃদ্ধির জন্য) ডেকে বলবেঃ আমাদের সাথে আমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করলে জান্নাত দেব) তা আমরা বাস্তব সত্য পেয়েছি! অতএব (তোমরা বল) তোমাদের সাথে তোমাদের পালনকর্তা যে ওয়াদা করেছিলেন (যে, কুফরের কারণে দোযখে পতিত হবে) তা তোমরাও সত্য পেয়েছ কি? (অর্থাৎ এখন আল্লাহ্ ও রসূলের সত্যতা এবং স্বীয় পথভ্রষ্টতার স্বরূপ জেনে ফেলেছ তো)? তারা (দোযখীরা উত্তরে) বলবেঃ হ্যাঁ। (বাস্তবিকই আল্লাহ্ ও রসূলের সব কথা ঠিক হয়েছে)। অতঃপর (দোযখীদের পরিতাপ ও জান্নাতীদের আনন্দ বৃদ্ধিকল্পে) একজন ঘোষক (অর্থাৎ কোন ফেরেশতা) উভয়ের (অর্থাৎ উভয় দলের) মাঝখানে (দাঁড়িয়ে) ঘোষণা করবেঃ আল্লাহ্ তা আলার অভিসম্পাত হোক ঐ জালিমদের উপর, যারা আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্য ধর্ম) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং তাতে (অর্থাৎ সত্যধর্মে সর্বদা স্বকল্পিতভাবে) বক্রতা (অর্থাৎ বক্রতার বিষয়বস্তু) অন্বেষণ করত (যেন তাতে দোষ ও আপত্তি উত্থাপন করতে পারে) এবং তারা (এতদসহ) পরকালেও অবিশ্বাসী ছিল (যার ফল আজ ভোগ করছে। এসব কথাবার্তা হচ্ছে জান্নাতীদের এবং তাদের সমর্থনে ঐশী ঘোষকের। অতঃপর আ'রাফবাসীদের কথা বলা হয়েছে)। এবং উভয়ের (অর্থাৎ জান্নাতী

ও দোযখী উভয় দলের) মাঝখানে আড়াল (অর্থাৎ প্রাচীর) থাকবে। (সূরা হাদীদে এ বিষয়-টির উল্লেখ রয়েছে فضرب بينهم بسور এর বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, জান্নাতের প্রতিক্রিয়া দোযখে এবং দোযখের প্রতিক্রিয়া জান্নাতে যেতে দেবে না। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাহলে এসব কথাবার্তা কিরূপে হবে? অতএব, সম্ভবত এ প্রাচীরে যে দরজা থাকবে, তা দিয়ে কথাবার্তা হবে; যেমন সূরা হাদীদে আছে باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب অথবা এমনিতেই আওয়াজ পৌঁছে যাবে)। এবং (এ প্রাচীর কিংবা এর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। এখান থেকে সব জান্নাতী ও দোযখী দৃষ্টিগোচর হবে)। আ'রাফের উপর অনেক লোক থাকবে, (যাদের নেকী ও গোনাহ্ দাঁড়িপাল্লায় সমান সমান হয়েছে)। তারা (জান্নাতী ও দোযখীদের মধ্য থেকে) প্রত্যেককে (জান্নাত ও দোযখের অভ্যন্তরে থাকার লক্ষণ ছাড়াও) তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। (চিহ্ন এই যে, জান্নাতীদের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য এবং দোযখীদের চেহারায় মলিনতা ও অন্ধকার থাকবে। যেমন, অন্য আয়াতে আছে ঃ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة الخ এবং আ'রাফ-বাসীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে ঃ سلام عليكم—তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখনও তারা জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না বরং প্রবেশ প্রার্থী হবে (হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাদের এ প্রার্থনা পূরণ করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হবে) এবং যখন তাদের দৃষ্টি দোযখীদের উপর পতিত হবে, (তখন ভীত হয়ে) বলবে ঃ হে আমাদের পালন-কর্তা! আমাদেরকে এ জালিমদের সাথে (আযাবের অন্তর্ভুক্ত) করো না। এবং (আ'রাফ-বাসীরা পূর্বে যেমন জান্নাতীদের সাথে সালাম ও বাক্যালাপ করেছে, তেমনি) আ'রাফবাসীরা (দোযখীদের মধ্য থেকে) অনেককে (যারা কাফির) যাদেরকে তাদের চিহ্ন (চেহারার অন্ধকার ও মলিনতা) দ্বারা চিনবে, (যে, এরা কাফির) ডেকে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও তোমাদের ঔদ্ধত্য (এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ না করা) তোমাদের কোন কাজে আসেনি (এবং তোমরা এ ঔদ্ধত্যের কারণে মুসলমানদেরকে ঘৃণিত মনে করে একথাও বলতে যে, এরা কি অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী হবে। যেমন, اهؤلاء من الله عليهم من بيننا—থেকেও এ বিষয়বস্তু বোঝা যায়। এখন এই মুসলমানদেরকে দেখ তো যারা জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করছে) এরা কি তারাই, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করবেন না। (এখন তো তাদের প্রতি এত বিরাট অনুগ্রহ হয়েছে যে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ) প্রবেশ কর জান্নাতে (তথায়) তোমাদের জন্য কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (এ বাক্যে বিশেষ করে رجالا 'অনেককে' বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সে সময় পর্যন্ত পাপী মু'মিনরাও দোযখে পড়ে থাকবে। এর ইঙ্গিত এই যে, আ'রাফবাসীরা যখন জান্নাতের